মুক্তি

অজয়কুমার ভট্টাচার্য

বিশ্বকবি গেয়েছেন, ''বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়/ সহস্র বন্ধনমাঝে মহানন্দময়/ লভিব মুক্তির স্বাদ।'' কিন্তু বৈরাগ্যসাধন বিনা কি মুক্তি হয়? বাসনাসংকুল বিষয়াসক্ত মনকে বৈরাগ্যের আগুনে শুদ্ধ না করলে কি সে মুক্তির পথযাত্রী হতে পারে? আর সহস্রবন্ধন মাঝে মুক্তির স্বাদ, এও তো এক আপাতবিরুদ্ধ কথা! দুটি বিপরীত, আলো আর অন্ধকারের মতন। বন্ধনের অনুভব থাকলে মুক্তির অনুভব অসম্ভব, আর যে মুক্তি অনুভব করে তার কাছে বন্ধনের অনুভব থাকতে পারে না। কিন্তু বৈরাগ্য ও মুক্তির তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাত ছিল বললে বোধহয় একটু বাড়াবাড়িই করা হবে। মুক্তির মধ্যে যে-অসীমের ব্যঞ্জনা আছে তাকে ভাষার গণ্ডির মধ্যে বাঁধতে গেলে তার তাৎপর্য ক্ষুণ্ণ হল বলে মনে হতে পারে। আসলে আমাদের অনুভবের ভাষা দিয়ে কোনও ইন্দ্রিয়-অনুভবোত্তর অবস্থার কথা প্রকাশ করতে গেলে শব্দার্থ ছাড়াও একটা আভাস বা ইঙ্গিতের অবকাশ থাকে। শুধুমাত্র শব্দার্থের ওপর নির্ভর না করে সেই আভাস বা ইঙ্গিতের অর্থবোধের চেষ্টা করলে বোধহয় বক্তব্যের প্রতি সুবিচার করা হয়। তাই অনেকের বিশ্বাস, 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি' বলতে রবীন্দ্রনাথ জগতের প্রতি উদাসীন থেকে যে-ব্যক্তিগত মুক্তির প্রচেষ্টা তাকেই নির্দেশ করেছেন, যেটি জ্ঞানমার্গীদের বিচার পথ। রবীন্দ্রনাথ কবি, তিনি সমগ্র জগতকে দেখেন নিজের অন্তঃস্থিত আনন্দের আলোয়। ঘোষণা করেন, ''জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।/ ধন্য হল ধন্য হল মানবজীবন''। আবার এও বলেন—''ইন্দ্রিয়ের দ্বার/ রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।/ যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে/ তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে॥'' জগতের সকল বস্তুতেই তাঁর আনন্দময় উপস্থিতি—এই অনুভবই কবির কাম্য। এই ভাবটি জগতের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত। ঠিক এরকমই, তবে আরও তীব্র এক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির এক ঝলক আমরা দেখি স্বামীজীর কথায়, যেখানে হৃদয়ের ভাষাই প্রাধান্য পেয়েছে। এ-চিত্র শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী এঁকেছেন 'স্বামি শিষ্য সংবাদে' :

স্বামীজী : যে সাধনভজন বা অনুভূতি দ্বারা পরের উপকার হয় না, মহামোহগ্রস্ত জীবকুলের কল্যাণ সাধিত হয় না, কামকাঞ্চনের গণ্ডি থেকে মানুষকে বের হতে সহায়তা করে না, এমন সাধন-ভজনে ফল কি? তুই বুঝি মনে করিস একটি জীবের বন্ধন থাকতে তোর মুক্তি আছে?... যত জন্মে তার উদ্ধার না হচ্ছে, তত কাল তোকেও জন্ম নিতে হবে তাকে সাহায্য করতে, তাকে ব্রহ্মানুভূতি করাতে! প্রতি জীব যে তোরই অঙ্গ। এইজন্যই পরার্থে কর্ম।

শিষ্য : এটি তো মহাশয় ভয়ানক কথা—সকলের মুক্তি না হইলে ব্যক্তিগত মুক্তি হইবে না! কোথাও তো এমন অদ্ভুত সিদ্ধান্ত শুনি নাই।... বেদান্তমতে ব্যষ্টিভাবই তো বন্ধনের কারণ। সেই উপাধিগত চিৎসত্তাই কাম্যকর্মাদিবশে বদ্ধ বলিয়া প্রতীত হন।... যাহার জীবজগদাদিবোধ থাকে, তাহার মনে হইতে পারে—সকলের মুক্তি না হইলে তাহার মুক্তি নাই। কিন্তু... মন নিরুপাধিক হইয়া যখন প্রত্যগ্‌ব্রহ্মময় হয়, তখন তাহার নিকট জীবই বা কোথায় আর জগৎই বা কোথায়?—কিছুই থাকে না।

স্বামীজী : হাঁ, তুই যা বলছিস তাই অধিকাংশ বেদান্তবাদীর সিদ্ধান্ত। উহা নির্দোষও বটে। ওতে ব্যক্তিগত মুক্তি অবরুদ্ধ হয় না। কিন্তু যে মনে করে আমি আব্রহ্ম জগৎটাকে আমার সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে মুক্ত হব, তার মহাপ্রাণতাটা একবার ভেবে দেখ দেখি।

শিষ্য : মহাশয়, উহা উদারভাবের পরিচায়ক বটে, তবে শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়।

স্বামীজী এই কথাটির উত্তর দেননি। শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের মধ্যে থেকে তো বটেই এমনকি তার বাইরে গিয়েও সমগ্র জীবকুলের জন্য এমন বেদনা অনুভব করা, তাকে উদ্ধারের তীব্র আকাঙ্ক্ষা বোধহয় সপ্তর্ষির ঋষির পক্ষেই সম্ভব। আসলে আমাদের মুক্তি সম্বন্ধে কোনও ধারণাই নেই। যেটুকু মুক্তির বোধ ও কামনা তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষণিক-মুক্তির আকাঙ্ক্ষা—দারিদ্র্যমুক্তি, রোগমুক্তি, যেকোনও সমস্যার সম্মুখীন হয়ে তার হাত থেকে মুক্তি। সর্বাত্মক মুক্তি কী তা আমরা ধারণা করতে পারি না, কারণ সর্বাত্মক বন্ধনের অনুভব আমাদের নেই। যেমন এক ফোঁটা বিশুদ্ধ জল সাগরে পড়লে তার আর আলাদা অস্তিত্বের অবকাশ থাকে না, সেই অনন্তে মিলিয়ে-যাওয়া মুক্তি যতই কবিত্বপূর্ণ ও শুনতে সুন্দর হোক তা ধারণাতে আনা অসম্ভব। এ-অসম্ভবকে সম্ভব করতে প্রয়োজন সারা জীবনের সাধনা। রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রান্তে পৌঁছে রোগশয্যা থেকে অনবদ্য ছন্দে প্রার্থনা করছেন, ''খ্যাতিমুক্ত বাণী মোর/ মহেন্দ্রের পদতলে করি সমর্পণ/ যেন চলে যেতে পারি নিরাসক্তমনে/ বৈরাগী সে সূর্যাস্তের গেরুয়া আলোয়;'' আর মনের নিরন্তর ভাবনা ছন্দে প্রকাশ করছেন—''বার বার মনে মনে বলিতেছি, আমি চলিলাম—/ যেথা নাই নাম,/ যেখানে পেয়েছে লয়/ সকল বিশেষ পরিচয়,/ নাই আর আছে/ এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে,/ যেখানে অখণ্ড দিন/ আলোহীন অন্ধকারহীন,/ আমার আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে/ পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগরসংগমে।''

এই মুক্তির অনুভব স্বামীজীর মনে প্রথম কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তা আমরা দেখে নিতে পারি। স্বামীজী তখন নরেন্দ্রনাথ, দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বর এসেছেন একা; ঠাকুরও ছোটো তক্তপোশে একা বসে যেন নরেনেরই অপেক্ষায়। তারপর? নরেন্দ্রের স্মৃতিচারণ : ''তিনি সহসা নিকটে আসিয়া নিজ দক্ষিণপদ আমার অঙ্গে সংস্থাপন করিলেন এবং উহার স্পর্শে মুহূর্তমধ্যে আমার এক অপূর্ব উপলব্ধি উপস্থিত হইল। চক্ষু চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, দেওয়ালগুলির সহিত গৃহের সমস্ত বস্তু বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় লীন হইয়া যাইতেছে এবং সমগ্র বিশ্বের সহিত আমার আমিত্ব যেন এক সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে একাকার হইতে ছুটিয়া চলিয়াছে! তখন দারুণ আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িলাম, মনে হইল—আমিত্বের নাশেই মরণ, সেই মরণ সম্মুখে—অতি নিকটে! সামলাইতে না পারিয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম, 'ওগো, তুমি আমায় একি করলে, আমার যে বাপ মা আছেন!' ''

স্বামীজীর অভিজ্ঞতার নিজমুখের এই বিবরণ আমাদের মুক্তিধারণার মূল ধরে নাড়া দেয়। তবে

আমাদের মুখে যে প্রায়শই উচ্চারিত হয়—'হে ভগবান আমাকে এ-সংসার থেকে মুক্তি দাও'? আসলে এই প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা যা চাই তা মুক্তি নয়, তা হল—এই বর্তমান দুঃখময় সংসার থেকে মুক্তি দিয়ে একটি সুখময় সংসার আমাকে দাও। সংসারের অসারতা, তার অনিত্যতা, চিরন্তন দুঃখময়তার বোধ ও বিশ্বাস না হলে মুক্তির কোনও ধারণা আসাই অসম্ভব। তার জন্যে চাই সারা জীবনের প্রস্তুতি। চাই আমাদের বন্ধনের অনুভব এবং সে-অনুভবের তীব্রতার দ্বারা আমাদের মধ্যে বন্ধনমুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে জাগরিত করে দেওয়া। সর্বোপরি প্রয়োজন বন্ধনের উৎসটিকে জানা, তবে তো তার গ্রন্থিচ্ছেদনের প্রয়াস করা সম্ভব হবে। স্বামী তুরীয়ানন্দজী ৪.২.১৯০৮ তারিখের পত্রে লিখছেন, ''বন্ধনাদি বাহিরে কোথাও নাই, সমস্তই ভিতরে থাকে।... আপনার সুকৃতিফলে এবং ভগবৎকৃপায় যখন মন নির্মল হয়, ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু বুঝিতে পারিলেও বন্ধনমুক্ত হওয়া সহজ নহে।'' এইখানেই অঘটনঘটন-পটীয়সী মহামায়ার কারুকাজ। ঠাকুর বলছেন, ''তাঁর মহামায়াতে এই জগৎসংসার। এই মায়ার ভিতর বিদ্যা-মায়া অবিদ্যা-মায়া দুই-ই আছে। বিদ্যা-মায়া আশ্রয় করলে সাধুসঙ্গ, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য—এই সব হয়। অবিদ্যা-মায়া—পঞ্চভূত আর ইন্দ্রিয়ের বিষয়—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ; যত ইন্দ্রিয়ের ভোগের জিনিস; এরা ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়।'' ''এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে/ ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি তা জানতে পারে/ বিল করে ঘুণি পাতে মীন প্রবেশ করে তাতে/ গতায়াতের পথ আছে তবু মীন পালাতে নারে।'' মুক্তির পথ খোলা, তবু সেপথে যাওয়ার চিন্তা মনে আনতে পারি না। মায়ার প্রভাবে যে-সংসারে দুঃখকষ্ট অশান্তিতে প্রতিনিয়ত দগ্ধ হচ্ছি তাকেই সার বলে একমাত্র কাম্য বলে মনে করছি এবং এ-সংসার কেন আমার ইচ্ছানুরূপ হচ্ছে না তার জন্যে বিলাপ করছি। এ এক কুহকই বটে। ঠাকুর বলছেন, ''মানুষের কি সাধ্য অপরকে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত করে। যাঁর এই ভুবনমোহিনী মায়া তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত করতে পারেন।'' চণ্ডীতে আছে, সাধারণ মানুষ তো দূর, জ্ঞানীকেও বলপূর্বক মহামায়া মোহগ্রস্ত করে রাখেন। আবার তিনিই প্রসন্না হলে মায়া থেকে মুক্তি দেন (১।৫৫-৫৬)। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, ''সত্যিই আমার দৈবীমায়া দুরতিক্রম্য, তবে যে আমার শরণ গ্রহণ করে, সে এই মায়াকে অতিক্রম করতে পারে। (গীতা, ৭।১৪)।'' একটি উপায় জানা গেল : কিন্তু এই শরণ নেওয়া, তাঁর শরণাগত হওয়া কি সহজ? সমস্ত বাসনার নিঃশেষে বলিদান দিতে হবে, বলতে হবে আন্তরিক ভাবে, 'তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ'। ঠাকুর বলছেন মুক্তিকামনা, ভক্তিকামনা কামনার মধ্যে নয়। কিন্তু বাকি বাসনা মনে হয় বলিদান দিলাম, অথচ কোথা হতে আবার সব এসে পড়ে। তাই শ্রীশ্রীমা বলছেন নির্বাসনা চাইতে হয়। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা, তাঁর কাছে নির্বাসনা চেয়ে তাঁরই শরণ নেওয়া। দেবর্ষি নারদ তাঁর বক্তব্যকে আমাদের মনে স্থায়ী রেখাপাত করানোর জন্য একই প্রশ্ন দুবার করছেন। বলছেন, ''কে মায়াকে অতিক্রম করে? কে পারে মায়াকে অতিক্রম করতে?'' নিজেই উত্তর দিচ্ছেন, ''যিনি আসক্তি ত্যাগ করেন, যিনি মহাপুরুষের সেবা করেন ও যিনি আমি আমার বোধ ত্যাগ করেন'' (নারদীয় ভক্তিসূত্র, ৪৬)। আসক্তি বাসনার মূল আর তা থেকেই সংসারের উৎপত্তি; যে-সংসার অনিত্য, দুঃখময় এবং সব যন্ত্রণার কারণ। তাই আসক্তিরূপ সংসারের জড়কে ত্যাগ করতে বলছেন। গীতাতে ওই কথাই বললেন শ্রীকৃষ্ণ, ''এই সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষের দৃঢ়মূলকে অনাসক্তিরূপ কুঠার দিয়ে কেটে নির্মূল করতে

হবে।" (১৫।৩) কিন্তু সংসারের দুঃখকষ্ট যন্ত্রণা কি আসক্তিত্যাগের স্পৃহা জাগায়? ঠাকুর বলছেন, ''উট কাঁটা ঘাস বড় ভালবাসে। কিন্তু যত খায় মুখ দিয়ে রক্ত দরদর করে পড়ে; তবুও সেই কাঁটা ঘাসই খাবে, ছাড়বে না।" আসক্তিত্যাগের ইচ্ছা জাগে মহাপুরুষের সঙ্গ করে ও তাঁর সেবায়, তাই নারদ মুনি মহাপুরুষের সেবার কথা বলেছেন। আসক্তিমুক্ত মহাপুরুষের আত্মানন্দের আলোয় সংসারীর চোখ ফোটে। সে তার ক্ষুদ্র সংসারের বাইরে আর এক জগতকে দেখতে পায় আর তাঁর সেবায় তার মধ্যে দীনতার ভাব জাগে। এই দীনতাই মহাপুরুষের জীবন আচার-আচরণ থেকে শিক্ষার প্রথম সোপান, তার থেকেই তাঁর প্রতি বিশ্বাস-শ্রদ্ধার উন্মেষ ও সংসারের মায়াতরণের নৌকায় প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু শুধুমাত্র নৌকায় চড়লেই সে-নৌকা চলে না, তার পাড়ের বাঁধন বা নোঙর তুলতে হয়। তাই নারদ বললেন, শেষ কর্তব্যটি হল আমি-আমার-বোধ ত্যাগ করতে হবে। এই দুস্তর মায়াসমুদ্রে অনুকূল কৃপাবাতাসও নিয়ে যেতে পারে না যদি অহংকার, মমত্ববোধরূপ নোঙর ফেলা থাকে। তাই ছড়িয়ে পড়া মমত্ববোধকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে আত্মস্থ না করলে নোঙর ওঠে না, নৌকাও চলে না।

এই মূলসূত্রগুলি পুরাণে রূপকের আকারে সহজবোধ্য কাহিনির মধ্য দিয়ে অতি চমৎকারভাবে বিবৃত, যা যুগে যুগে ভারতবাসীকে শুধু নয়, জগদ্‌বাসীকে অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা রাখে। আমরা দৃষ্টান্ত হিসেবে রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনিটি স্মরণ করতে পারি। তিনি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর ছিলেন। এটি ভৌগোলিকভাবে না নিয়ে ভাবগত দিক থেকে নিলে বুঝতে সুবিধা হবে। এক হিসেবে আমরা প্রত্যেকেই সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর। আমরা প্রত্যেকেই মনে করি এ-সমগ্র জগৎ আমাদের ভোগের জন্য সৃষ্ট এবং তাতে আমাদের অধিকার আছে। মুনি বিশ্বামিত্র যখন তাঁর কাছে সমগ্র পৃথিবী চেয়ে নিলেন তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র তাঁকে যা দিলেন তা ওই—তাঁর পৃথিবীর ওপর অধিকারবোধ ও সাম্রাজ্যের ওপর আসক্তি। পৃথিবীর ওপর অধিকার হারানোর ফলে তাঁর এখন থাকবার জায়গা নেই। কোথায় থাকবেন, তাই বিশ্বামিত্র বললেন—কাশী বিশ্বনাথ সৃষ্ট জায়গা এই পৃথিবীর বাইরে—অর্থাৎ এ-বাসনাকলুষিত সংসার, এ-পৃথিবীর মালিন্য যেখানে প্রবেশ করেনি, সেখানে গিয়ে থাকো। রাজা হরিশ্চন্দ্র দুটি কাজ একসঙ্গে করলেন। ঋষি বিশ্বামিত্রের প্রার্থনা পূরণ করে, তাঁর সেবায় লাগলেন ও পৃথিবীর ওপর থেকে সমস্ত অধিকারবোধ ও আসক্তি ত্যাগ করে দীনাতিদীন হয়ে কাশীবাসী হলেন। কিন্তু মায়াতরণের প্রয়োজনে আর একটি করণীয় বাকি, তাই বিশ্বামিত্র বললেন, ''তোমার দানে আমি তুষ্ট, তবে এই দানগ্রহণ করে তোমায় যে-পুণ্যার্জনের সুযোগ করে দিলাম তার জন্যে দক্ষিণা দাও।" সর্বহারা রাজা আর কী দিতে পারেন? শেষ সম্পর্ক স্ত্রীপুত্র, তাদের কাশীতে এক ব্রাহ্মণের কাছে বিক্রয় করে দিলেন। এই আমার-বোধ মুক্ত হয়ে তাঁর আর নিজের অহংটুকু ছাড়া কিছুই রইল না। তারও বিসর্জন ঘটল নিজেকে এক চণ্ডালের কাছে বিক্রয় করে, যেটি তাঁর আত্মবিলয়, তাঁর আত্মবিলুপ্তির প্রক্রিয়া। এই বিক্রয়লব্ধ অর্থে দিলেন ঋষির দক্ষিণা। শেষে দিতে হল তাঁর সর্বত্যাগের পরীক্ষা, যখন তাঁর পুত্রের মৃতদেহ কোলে রোদনরতা স্ত্রী বিধাতার নির্বন্ধে তাঁরই শ্মশানে সৎকারের উদ্দেশ্যে হাজির হলেন। নিজহাতে আত্মজের শেষচিহ্নটুকু অগ্নিতে বিসর্জন দেওয়ার মুহূর্তেই ঋষি বিশ্বামিত্রের পুনরাবির্ভাব। রাজার অদ্ভুত ত্যাগে সন্তুষ্ট মুনি ফিরিয়ে দিলেন সব। কিন্তু হরিশ্চন্দ্রের ফিরে পাওয়া রাজ্য আর সেই রাজ্য রইল না। সে-সসাগরা পৃথিবী এখন তাঁর কাছে এক মায়াতীত জগতে পরিণত।

আসক্তিহীন অভিমানহীন রাজার তখন এ-জগতে ''বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা''।

জীবন্মুক্তি সাধনের এক অপূর্ব উপাখ্যান। স্বামী তুরীয়ানন্দজী বিবেকচূড়ামণির অনুসরণে বলতেন জীবন্মুক্তি-সুখপ্রাপ্তির জন্যই মনুষ্যদেহ ধারণ, এর আর অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই। আরও বলতেন ব্রাহ্মণশরীর কেবলমাত্র তপস্যারই জন্য। অবশ্যই ব্রাহ্মণ বলতে শুধুমাত্র জাতি বোঝাননি, যে-শরীরে ব্রহ্মাভিলাষ, ঈশ্বরাভিলাষ কিঞ্চিৎ জাগরিত হয়েছে তাকেই উদ্দেশ্য করেছেন। ঠাকুর বলছেন, জ্ঞান হলে মানুষ খড়ো নারকেলের মতো হয়ে যায়। যে-নারকেলের শাঁস খোলার মধ্যে শুকিয়ে যায় তা ভেতরে ঢপর ঢপর করে, সেইরকম জ্ঞানীর আত্মা শরীরের মধ্যে থেকেও শরীর থেকে আলাদা হয়ে থাকে। তবে নারকেলের শুকনো শাঁস যেমন খোলার গায়ে কোথাও না কোথাও লেগে থাকে তেমনই জ্ঞানীর আত্মাও শরীরের কোথাও না কোথাও একটু লেগে থাকাতেই তাঁর শরীর টিকে থাকে। এই অবস্থাই অপবর্গ লাভ বা জীবন্মুক্তি। এই অপবর্গ শব্দটির একটি সুন্দর ব্যাখ্যা আছে। অপবর্গ অর্থাৎ 'পবর্গ'হীন। আমাদের বর্ণমালায় পাঁচটি করে অক্ষর নিয়ে এক একটি বর্গ। ক বর্গ, চ বর্গ, ট বর্গ ইত্যাদি। পবর্গহীন মানে 'প'-এ পতন নেই, তার কারণ 'ফ'-এ ফল অর্থাৎ কর্মফল তার ওপর ক্রিয়া করে না, যেহেতু 'ব'-এ বন্ধন তার নেই, আর বন্ধন নেই বলেই 'ভ'-এ ভয় নেই এবং 'ম'-এ মোহ তাঁকে পরিত্যাগ করেছে। এটি লাভের জন্যই সাধকের সাধনা। গীতাতে অর্জুন আমাদের হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে এঁদের আচারব্যবহার কেমন হয় জিজ্ঞাসা করছেন। শ্রীকৃষ্ণ বহুভাবে তাঁদের ব্যবহার, তাঁদের চলন এমন মনোজ্ঞভাবে বর্ণনা করছেন যে, চিন্তাশীল সাধকেরা সে-অবস্থায় পৌঁছনোর প্রাণপণ সাধনাতে জীবন অতিবাহিত করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ধূলামন্দির' কবিতায় বলছেন, ''আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন পরে, বাঁধা সবার কাছে''। এ-সৃষ্টির বাঁধনে বাঁধা জীবজগতে যে তিনিই ওতপ্রোত এইটি দেখার সাধনা ও সিদ্ধিই তো জীবন্মুক্তি সাধনার শেষকথা।

কথামৃত থেকে আমরা এই জীবন্মুক্ত পরমহংসের একটি চিত্র স্মরণ করতে পারি। ''শ্রীরামকৃষ্ণ—কেউ বললে, অমুক স্থানে হরিনাম নাই। বলবামাত্রই দেখলাম, তিনিই সব জীব হয়ে আছেন। যেন অসংখ্য জলের ভুড়ভুড়ি—জলের বিম্ব!... বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ... অনেকক্ষণ সম্ভোগের পর বাইরের একটু হুঁশ আসিতেছে। এইবার বালকের ন্যায় হাসিতেছেন। হেসে হেসে ঘরের মধ্যে পাদচারণ করিতেছেন। অদ্ভুতদর্শনের পর চক্ষু হইতে যেরূপ আনন্দ-জ্যোতিঃ বাহির হয়, সেইরূপ ঠাকুরের ভাব হইল। মুখে হাস্য। শূন্য দৃষ্টি। ঠাকুর পায়চারি করিতে করিতে বলিতেছেন—'বটতলায় পরমহংস দেখলাম—এইরকম হেসে চলছিল! সেই স্বরূপ কি আমার হল!' ''

একটি অনুপম ধ্যানযোগ্য চিত্র। মনে হতে পারে এ তো দেহধারী ঈশ্বরের ব্যাপার, এ তো কোনও জীবন্মুক্ত সিদ্ধপুরুষের নয়! অবশ্যই এ পূর্ণশক্তি নিয়ে আবির্ভূত দেহধারী ঈশ্বরের চিত্র, কিন্তু এ-ঈশ্বর তো ধরা ছোঁয়ার বাইরে কোনও ঐশ্বর্যশালী সুদূরের বাসিন্দা হয়ে থাকেননি। নিতান্ত এ-মালিন্যভরা, কলুষময় সংসারে আমাদের সঙ্গে আমাদের সমব্যথী হয়ে অনন্ত মঙ্গলকামনা নিয়ে এক মুক্ত জীবন কাটিয়ে গেছেন; আর আধার অনুযায়ী তাঁর ভক্তদের মুক্তজীবনে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তাই তাঁর জীবনের যেকোনও খণ্ডচিত্রই সে-মুক্তজীবনের আকাঙ্ক্ষা জাগাতে সমর্থ। শুধু আমাদের দরকার একটু সে-চিত্রগুলির মনন, চিন্তন ও তাতে ডুব দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

''চাওয়া পাওয়ার পথে পথে দিন কেটেছে কোনমতে/ এখন সময় হল তোমার কাছে আপনাকে দিই আনি।''